৮১- সূরা আত-তাকভীর[১]
২৯ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١

وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ۝٢

১. সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হবে[২],

২. আর যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে[৩],

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে কেউ কেয়ামতকে প্রত্যক্ষ দেখতে চায় সে যেন সূরা 'ইযাস সামছু কুওয়িরাত, ইযাস সামায়ুন ফাতারাত ও ইযাস সামায়ূন সাক্কাত' পড়ে। [তিরমিযী: ৩৩৩৩, মুসনাদে আহমাদ: ২/২৭, ৩৬, ১০০, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫১৫] এখানে প্রথম ছয়টি আয়াতের ভাষ্য কিয়ামতের প্রথম অংশ অর্থাৎ শিঙ্গায় প্রথমবার যে ফুৎকার দেয়া হবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট। উবাই ইবন কাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'কেয়ামতের পূর্বে ছয়টি নিদর্শন রয়েছে। মানুষ যখন হাটে-বাজারে থাকবে, তখন হঠাৎ সূর্যের আলো চলে যাবে এবং তারকারাজি দেখা যাবে; ফলে তারা আশ্চর্য হবে। তারা তাকিয়ে দেখার সময়েই হঠাৎ করে তারাগুলো খসে পড়বে। এরপর পাহাড়গুলো মাটির উপর পড়বে, নড়া-চড়া করবে এবং পুড়ে যাবে; ফলে বিক্ষিপ্ত ধুলোর মত হয়ে যাবে। তখন মানুষ জিনের কাছে এবং জিন মানুষের কাছে ছুটে আসবে। জন্তু-জানোয়ার-পাখি সব মিশে যাবে এবং একে অপরের সাথে একত্রিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর যখন বন্য পশুগুলোকে একত্র করা হবে" [সূরা তাকভীর: ৫] তারপর জিন মানুষদের বলবে, আমরা তোমাদের নিকট সংবাদ নিয়ে আসছি। তারা যখন সাগরের নিকট যাবে তখন দেখবে তাতে আগুন জ্বলছে। এ সময়ে সপ্ত যমীন পর্যন্ত এবং সপ্ত আসমান পর্যন্ত এক ফাটল ধরবে। এরপর এক বায়ু এসে তাদেরকে মৃত্যুবরণ করাবে।' [তাবারী]

(২) আরবী ভাষায় তাকভীর মানে হচ্ছে গুটিয়ে নেয়া। মাথায় পাগড়ী বাঁধার জন্য "তাকভীরুল 'ইমামাহ" বলা হয়ে থাকে। কারণ ইমামা তথা পাগড়ী লম্বা কাপড়ের হয়ে থাকে এবং মাথার চারদিকে তা জড়িয়ে নিতে হয়। এই সাদৃশ্য ও সম্পর্কের কারণে সূর্য থেকে যে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে তাকে পাগড়ীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন এই সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে। অর্থাৎ তার আলোক বিচ্ছুরণ বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া كُوِّرَتْ এর অপর অর্থ নিক্ষেপ করাও হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে, "চাঁদ ও সূর্যকে কিয়ামতের দিন পেঁচিয়ে রাখা হবে।" [বুখারী: ৩২০০] [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ যে বাঁধনের কারণে তারা নিজেদের কক্ষপথে ও নিজেদের জায়গায় বাঁধা আছে তা খুলে যাবে এবং সমস্ত গ্রহ-তারকা বিশ্ব-জাহানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এ ছাড়াও তারা শুধু ছড়িয়েই পড়বে না বরং এই সঙ্গে আলোহীন হয়ে অন্ধকারও হয়ে যাবে। [সাদী]

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾

৩. আর পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে(১),

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾

৪. আর যখন পূর্ণগর্ভা মাদী উট উপেক্ষিত হবে(২),

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾

৫. আর যখন বন্য পশুগুলো একত্র করা হবে,

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾

৬. আর যখন সাগরকে অগ্নিউত্তাল করা হবে(৩),

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾

৭. আর যখন আত্মাগুলোকে সমগোত্রীয়দের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে(৪),

(১) পাহাড়সমূহকে কয়েকটি পর্যায়ে চলমান করা হবে। প্রথমে তা বিক্ষিপ্ত বালুরাশির মত হবে, তারপর তা ধূনিত পশমের মত হবে, সবশেষে তা উৎক্ষিপ্ত ধুলিকণা হয়ে যাবে এবং তার জায়গায় আর অবস্থিত থাকবে না। [সাদী]

(২) আরবদেরকে কিয়ামতের ভায়াবহ অবস্থা বুঝাবার জন্য এটি ছিল একটি চমৎকার বর্ণনা পদ্ধতি। কেননা কুরআন আরবদেরই সম্বোধন করা হয়েছে। আরবদের কাছে গর্ভবর্তী মাদী উট, যার প্রসবের সময় অতি নিকটে, তার চাইতে বেশী মূল্যবান আর কোন সম্পদই ছিল না । এ সময় তার হেফাজত ও দেখাশুনার জন্য সবচেয়ে বেশী যত্ন নেয়া হতো। এই ধরনের উষ্ট্রীদের থেকে লোকদের গাফেল হয়ে যাওয়ার মানে এই দাঁড়ায় যে, তখন নিশ্চয়ই এমন কোন কঠিন বিপদ লোকদের ওপর এসে পড়বে যার ফলে তাদের নিজেদের এই সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ সংরক্ষণের কথা তাদের খেয়ালই থাকবে না। [ইবন কাসীর, সাদী]

(৩) এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। একটি অর্থ হল অগ্নিসংযোগ করা ও প্রজ্জ্বলিত করা। কেউ কেউ বলেন, সমুদ্রগুলোকে স্ফীত করা হবে। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, পানি পূর্ণ করা হবে। অন্য কেউ অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা অর্থাৎ সমস্ত সমুদ্র এক করে দেয়া হবে, ফলে লবনাক্ত ও সুমিষ্ট পানি একাকার হয়ে যাবে। হাসান ও কাতাদাহ রাহেমাহুমাল্লাহ বলেন, এর অর্থ তার পানিসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাবে ফলে তাতে এক ফোটা পানিও থাকবে না। [কুরতুবী]

(৪) এর অর্থ হচ্ছে, যখন মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে। অর্থাৎ মানুষের আমল অনুসারে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হবে। যখন হাশরে সমবেত লোকদেরকে বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ করে দেয়া হবে। এই দলবদ্ধকরণ ঈমান ও কর্মের দিক দিয়ে করা

৮. আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে[১] জিজ্ঞেস করা হবে,	وَإِذَا الْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ۝٨
৯. কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল[২]?	بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩
১০. আর যখন আমলনামাগুলো উন্মোচিত করা হবে,	وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠
১১. আর যখন আসমানের আবরণ অপসারিত করা হবে[৩],	وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١١

হবে। কাফের এক জায়গায় ও মুমিন এক জায়গায়। কাফের এবং মুমিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পার্থক্য থাকে। এদিকে দিয়ে কাফেরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মুমিনদেরও বিশ্বাস এবং কর্মের ভিত্তিতে দল হবে। যারা ভাল হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করবে তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। উদাহরণত ইহুদীরা ইহুদীদের সাথে, নাসারারা নাসারাদের সাথে, মুনাফিকরা মুনাফিকদের সাথে এক জায়গায় সমবেত হবে। মূলত হাশরে লোকদের তিনটি প্রধান দল হবে- ১। পূর্ববর্তী সৎকর্মী লোকদের ২। আসহাবুল ইয়ামীনের এবং ৩। আসহাবুশ শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফের পাপাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না। [তাবারী, কুরতুবী] এ আয়াতের আরেকটি অর্থও হতে পারে। আর তা হল, 'যখন আত্মাকে দেহের সাথে পুনঃমিলিত করা হবে'। কেয়ামতের সময়ে সকলকে জীবিত করার জন্য প্রথমে দেহকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। অতঃপর আত্মাকে দেহের সাথে সংযোজন করা হবে। [কুরতুবী, ইবন কাসীর] এ আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী আয়াত থেকে কিয়ামতের দ্বিতীয় অংশের আলোচনা শুরু হচ্ছে।

(১) الْمَوْءُۥدَةُ শব্দের অর্থ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। জাহেলিয়াত যুগের কোন কোন আরব গোত্র কন্যা সন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। [ইবন কাসীর, কুরতুবী] পরবর্তীতে ইসলাম এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করে।

(২) কোন কোন মুফাসসির বলেন, এই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীতে মারাত্মক ধরনের ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায়। যে পিতা বা মাতা তাদের মেয়েকে জীবিত পুঁতে ফেলেছে আল্লাহর কাছে তারা এত বেশী ঘৃণিত হবে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না, তোমরা এই নিষ্পাপ শিশুটিকে হত্যা করেছিলে কোন অপরাধে? বরং তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ছোট্ট নিরপরাধ মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাকে কোন অপরাধে মেরে ফেলা হয়েছিল? [ইবন কাসীর]

(৩) كشطت এর আভিধানিক অর্থ জন্তুর চামড়া খসানো। [কুরতুবী] এর অর্থ অপসারণ করা, সরিয়ে নেয়া। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন মাথার উপর ছাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে অপসারিত করা হবে। [মুয়াসসার, সাদী]

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾

১২. আর যখন জাহান্নামকে ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত করা হবে,

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾

১৩. আর যখন জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে,

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি উপস্থিত করেছে(১) ।

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾

১৫. সুতরাং আমি শপথ করছি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের,

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾

১৬. যা চলমান, অপসৃয়মাণ,

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾

১৭. শপথ রাতের যখন তা শেষ হয়,(২)

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾

১৮. শপথ প্রভাতের যখন তার আবির্ভাব হয়,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾

১৯. নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী(৩)

---

(১) অর্থাৎ কেয়ামতের উপরোক্ত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি নিয়ে এসেছে । অর্থাৎ সৎকর্ম কিংবা অসৎকর্ম সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে । [মুয়াসসার]

(২) عَسْعَسَ শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে । একটি উপরে আছে, তা হচ্ছে বিদায় নেয়া, শেষ হওয়া । অপর অর্থ হল আগমন করা, প্রবেশ করা । তখন আয়াতটির অর্থ হয়, শপথ রাতের, যখন তা আগমন করে । [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে সম্মানিত বাণীবাহক ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ বলতে অহী আনার কাজে লিপ্ত ফেরেশতা জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে বোঝানো হয়েছে । পরবর্তী আয়াতে এ-কথাটি আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে । নবী-রাসূলগণের মতো ফেরেশতাগণের বেলায়ও রাসূল শব্দ ব্যবহৃত হয় । উল্লেখিত সবগুলো বিশেষণ জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এর জন্যে বিনা দ্বিধায় প্রযোজ্য । তিনি যে শক্তিশালী, তা অন্যত্রও বলা হয়েছে, ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ "তাঁকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী" [সূরা আন-নাজম:৫] । তিনি যে আরশ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর তা মি'রাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে; তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে আকাশে পৌছলে তাঁর আদেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয় । তিনি যে أمين তথা বিশ্বাসভাজন তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না; আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তার আমানত বা বিশ্বস্ততার ঘোষণা দিয়েছেন, তাকে অহীর আমানত দিয়েছেন । [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿٢٠﴾

২০. যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের কাছে মর্যাদা সম্পন্ন,

مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿٢١﴾

২১. সে মান্য সেখানে, বিশ্বাসভাজন(১)।

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾

২২. আর তোমাদের সাথী উন্মাদ নন(২),

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾

২৩. তিনি তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন(৩),

আর কুরআনকে "বাণীবাহকের বাণী" বলার অর্থ এই নয় যে, এটি ঐ সংশ্লিষ্ট ফেরেশতার নিজের কথা। বরং "বাণীবাহকের বাণী" শব্দ দু'টিই একথা প্রকাশ করছে যে, এটি সেই সত্তার বাণী যিনি তাকে বাণীবাহক করে পাঠিয়েছেন। সূরা 'আল-হাক্কা'র ৪০ আয়াতে এভাবে কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী বলা হয়েছে। সেখানেও এর অর্থ এই নয় যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা। বরং একে "রাসূলে করীমের" বাণী বলে একথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি পেশ করছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ হিসেবে নয়। উভয় স্থানে বাণীকে ফেরেশতা ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পর্কিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বাণী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বাণীবহনকারী ফেরেশতার মুখ থেকে এবং লোকদের সামনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল। [বাদায়িউত তাফসীর]

(১) অর্থাৎ এই কুরআন একজন সম্মানিত দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল। তিনি ফেরেশতাদের নিকট মান্য। সমস্ত ফেরেশতা তাকে মান্য করে। তিনি আল্লাহ্‌র বিশ্বাসভাজন; পয়গাম আনা নেয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম বেশী করার সম্ভাবনা নেই। নিজের পক্ষ থেকে তিনি কোন কথা আল্লাহর অহীর সাথে মিশিয়ে দেবেন না। বরং তিনি এমন পর্যায়ের আমানতদার যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু বলা হয় সেগুলো তিনি হুবহু পৌছিয়ে দেন। [মুয়াসসার, সাদী]

(২) এখানে সাথী বলতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উম্মাদ বলত এতে তাদেরকে জওয়াব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ঠিক নয় যে, কুরআনে যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে এগুলো কোন পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের বক্তব্য। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে প্রকাশ্য দিগন্তে, মূল আকৃতিতে দেখেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿فَاسْتَوٰى ۞ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى﴾ "সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে" [সূরা আন-নাজম:৬-৭] [ইবন কাসীর] এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾

২৪. তিনি গায়েবী বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়[১]।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾

২৫. আর এটা কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. কাজেই তোমরা কোথায় যাচ্ছ?!

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ,

لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾

২৮. তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য[২]।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. আর তোমরা ইচ্ছে করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন[৩]।

জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এর সাথে পরিচিত ছিলেন। তাকে আসল আকার আকৃতিতেও দেখেছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনরূপ সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই।

(১) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাছ থেকে কোন কথা গোপন রাখেন না। গায়েব থেকে তার কাছে যে-সব তথ্য বা অহী আসে তা সবই তিনি একটুও কমবেশী না করে তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। [সা'দী]

(২) অন্য কথায় বলা যায়, এ বাণীটি তো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য উপদেশ একথা ঠিক, কিন্তু এর থেকে ফায়দা একমাত্র সেই ব্যক্তি হাসিল করতে পারে যে নিজে সত্য-সরল পথে চলতে চায়। এ উপদেশ থেকে উপকৃত হবার জন্য মানুষের সত্য-সন্ধানী ও সত্য প্রিয় হওয়া প্রথম শর্ত। [বাদায়িউত তাফসীর]

(৩) অর্থাৎ তোমরা সরল পথে চলতে চাইলে এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাইলেই থাকতে পারবে না যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা না করবেন। সুতরাং তাঁর কাছেই তাওফীক কামনা করো। তবে এটা সত্য যে, কেউ যদি আল্লাহ্‌র পথে চলতে ইচ্ছে করে তবে আল্লাহ্‌ও তাকে সেদিকে চলতে সহযোগিতা করেন। মূলত আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হওয়ার পরই বান্দার সে পথে চলার তাওফীক হয়। বান্দার ইচ্ছা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারেই হয়। তবে যদি ভাল কাজ হয় তাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থাকে, এটাকে বলা হয় 'আল্লাহ্‌র শরীয়তগত ইচ্ছা'। পক্ষান্তরে খারাপ কাজ হলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সংঘটিত হলেও তাতে তাঁর সন্তুষ্টি থাকে না। এটাকে বলা হয় 'আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক ইচ্ছা'। এ দু' ধরনের ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য না করার কারণে অতীতে ও বর্তমানে অনেক দল ও ফের্‌কার উদ্ভব ঘটেছে। [দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ইস্তেকামাহ: ১/৪৩৩; মিনহাজুস সুন্নাহ: ৩/১৬৪]